দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 15 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে

অধ্যাপক ড. এমএ মাননান

দিনটি ছিল মঙ্গলবার। ১৯৮৫-এর ১৫ অক্টোবর। শরতের এলোমেলো হাওয়ায় হালকা বৃষ্টিভেজা দিন। সন্ধ্যায় নামে ঝিরঝির বৃষ্টি। মেঘলা সন্ধ্যার মন খারাপ করা সময়টায় একে একে আসছে অনেকে, ঢুকছে মিলনায়তনে। কেউ শিক্ষার্থী, কেউবা অতিথি। সারি সারি চেয়ারে বসেছে সবাই। জায়গা না পেয়ে কেউ কেউ পেছনে কিংবা দরজার পাশে দাঁড়ানো। দৃষ্টি সবার বিটিভির পর্দায়। সবেমাত্র বাংলা সংবাদ শেষ হলো। বিজ্ঞাপন হচ্ছে। প্রায় চারশ মানুষ যে যার মতো জায়গা করে নিয়েছে অনুদ্বেপায়ণ ভবনে, জগন্নাথ হলের পূর্ব-দক্ষিণ পাশের পুরনো ১৯২৫ সালে নির্মিত তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদ ভবন, অ্যাসেম্বলি হলে। একটু পরেই শুরু হবে মহান মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জনপ্রিয় সিরিজের নাটক 'শুকতারা'। ঘড়ির কাঁটায় রাত আটটা তিরিশ মিনিট। শুরু হয়েছে নাটকের আজকের পর্ব। সবাই নিঃশব্দ। চোখ নিবদ্ধ ওখানে। আর বাইরে তুমুল বৃষ্টি, দমকা হাওয়া। ঘড়ির কাঁটা এগোচ্ছে। কাঁটাটা যখন আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ঘরে, তখনই অকস্মাৎ সেই দুর্যোগ নেমে এলো ভবনটিতে। বিকট আওয়াজে ধসে পড়ল জরাজীর্ণ অ্যাসবেস্টজের ছাদ। নিমিষেই নিভে গেল ৩৪টি তাজা প্রাণ। পরে আরও ৬ জন হারিয়ে গেল চিরতরে চিকিৎসাধীন অবস্থায়। আহত হলো তিন শতাধিক। পরের দিন দৈনিক পত্রিকাগুলোতে মর্মান্তিক ঘটনার বিস্তারিত দেখে সারা দেশের মানুষ কেঁদেছে। ঘটনার দিন তো ঢাকা শহরের মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এসেছিল হল প্রাঙ্গণে আকুলিত হৃদয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আহতদের প্রাণ বাঁচাতে, বিনা দ্বিধায় রক্ত দিয়েছিল হাসপাতালে। ঠিক মুক্তিযুদ্ধের মতো সবাই এক হয়ে এ দুর্যোগকে মোকাবিলা করেছে। কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা আর অব্যবস্থাপনার প্রতি ক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, যা আমাদের আজও অনুপ্রাণিত করে, আলোড়িত করে। যেমনটি হয়েছিল স্বাধীনতাপূর্ব গণআন্দোলনের সময়, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে, তেমনটি আমরা দেখতে পেয়েছি জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডির সময়। নতুন স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অবগাহিত সর্বস্তরের মানুষ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে সংহতি ও সহমর্মিতার যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত সেদিন স্থাপন করেছিল তা চিরকাল বাংলাদেশের সবাইকে, প্রজন্মের পর প্রজন্মকে সাহস জোগাবে।

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক এবং সিনেট সদস্য। থাকি সেন্ট্রাল রোডে। টিভিতে খবরটি শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। খবর নিতে থাকলাম সহকর্মীদের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে আমার আগ্রহ ছিল আরও একটি বিশেষ কারণে। জগন্নাথ হলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার ঢাকার জীবনের প্রথম দিনটি। ১৯৬৮-এর জুনের সম্ভবত প্রথম সপ্তাহের কোনো এক দিন লাকসাম জংশন থেকে প্রথমবারের মতো ট্রেনে চাপলাম ঢাকার উদ্দেশে। লক্ষ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া। অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে। বয়স মাত্র আঠারো। শহর সম্বন্ধে শুধু কেতাবি ধারণা। পরিচিত কেউ ঢাকায় থাকে না। তাই অচেনা শহরে কোথায় থাকব, কার

কাছে যাব, কিছুই জানা ছিল না। শুধু জানতাম আমার এক চাচাতো মামা পড়েন দর্শন বিভাগে, থাকেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। ব্যস, এটুকুই। নানা বা নানি এর বেশি আর কিছুই বলতে পারেননি। বিকালের দিকে পৌঁছলাম কমলাপুর রেলস্টেশনে। দুরু দুরু বুকে উঠলাম একটি রিকশায়। সলিমুল্লাহ হলের ঠিকানাও জানি না। মনে পড়ল জগন্নাথ হলে থাকেন আমার হাইস্কুলের একজন শিক্ষক, উমেশ রায় চৌধুরী, বুক-কিপিংয়ের শিক্ষক ছিলেন, অমায়িক মুখটা ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। তাই রিকশাচালককে জগন্নাথ হলে যেতে বললাম। মনে পড়ে, সে হাইকোর্টের কাছে এসে রাস্তার একজনকে জিজ্ঞেস করে, জগন্নাথ হল কোথায়? আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। ঠকবাজ লোকের পাল্লায় পড়লাম না তো! যা হোক অবশেষে পৌঁছলাম জগন্নাথ হলে। গেটে উমেশ বাবুর নাম বলতেই দারোয়ান চিনল। আমি ওনার কক্ষে গিয়েই পেয়ে গেলাম। বিশাল স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এখানেই আমার দিনবাস (রাত্রিবাস নয়)। পরের কাহিনি অন্য কিছু; এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। আমার ঢাকা শহরের জীবন শুরু এ জগন্নাথ হল থেকে। তাই স্মৃতিতে সব সময় এ হলটি অমর। অভাবনীয় দুর্ঘটনাটির খবর শুনে তাই হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম।

জগন্নাথ হলের সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরবর্তীকালে কিছু ভালো পদক্ষেপ নিয়েছে, আমি মনে করি, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রতিবছর রুটিনমাফিক নিয়মিত প্রত্যেকটি ভবন পরিদর্শন করা, প্রয়োজনীয় মেরামত বা সংস্কারের কাজ সঙ্গে সঙ্গেই সম্পন্ন করে ফেলা, প্রকৌশল বিভাগের মতামতকে মাথায় রেখে কর্তাব্যক্তিদের নিজস্ব বিবেক কাজে লাগানো। সর্বোপরি, নির্দিষ্ট কাজটি সঠিক সময়ে সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, তা প্রায় প্রত্যেক দিন মনিটর করা। যদি এমনটি হয়, আমাদেরকে আর জগন্নাথ হলের করুণ ট্র্যাজেডি দেখতে হবে না। কোনো মায়ের বুক খালি হবে না, ভাই বা বোনের অনাকাঙ্ক্ষিত অকাল প্রয়াণে কোনো বোনের চোখে অশ্রু দেখতে হবে না। বাবার আহাজারিতে আলোয় ভরা আকাশ মুহ্যমান হবে না।

এখনো ভূমিকম্প হলে কিংবা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া দেখলে সে রাতটির কথা মনে পড়ে। অনেক সময় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। উৎকণ্ঠা কাজ করে আমার মধ্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কিছু হল যেমন আমার নিজের ব্যক্তিগত স্মৃতিবিজড়িত মাস্টারদা সূর্যসেন হল, মুহসীন হল, সলিমুল্লাহ হল, ফজলুল হক হল ও কার্জন হল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এ হলগুলোর আশু মেরামত ও সংস্কার প্রয়োজন। সময় থাকতেই সজাগ হওয়া জরুরি। আমার পুরো জীবনের প্রায় সত্তর ভাগ সময় কেটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে– ছাত্র হিসেবে ৬ বছর, শিক্ষক হিসেবে ৪০ বছর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন থেকে কার্জন হল পর্যন্ত প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মিশে আছে আমার নানা রঙের স্মৃতি। আমি চাই না, কোনোভাবেই কামনা করি না যে, আর কোনো দুঃস্বপ্নময় 'অক্টোবর' ফিরে আসুক আমার প্রাণপ্রিয় এ প্রতিষ্ঠানে।

অক্টোবর ট্র্যাজেডির শিকার সবাইকে উদ্দেশ করে বলছি, 'স্মরণের আবরণে মরণেরে রাখি ঢাকি। মরণসাগরপারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি।'

❑ অধ্যাপক ড. এমএ মাননান : শিক্ষাবিদ কলাম লেখক ও উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়